শান্তিনিকেতন

(চতুর্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. 4109
8/9/09
CALCUTTA

RARE BOOK

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্‌

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

পাওয়া	...	...	১
সমগ্র	...	...	৯
কর্ম্ম	...	...	১৬
শক্তি	...	...	২৪
প্রাণ	...	...	২৯
জগতে মুক্তি	...	...	৩৫
সমাজে মুক্তি	...	...	৪৫
মত	...	...	৫০
নির্ব্বিশেষ	...	...	৫৮
দুই	...	...	৬৫
বিশ্বব্যাপী	...	...	৭৪
মৃত্যুর প্রকাশ	...	...	৮১

শান্তিনিকেতন

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্তলাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্ম্মনীতিই তাদেব শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিষ—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনো-কালেই মানুষ পৌঁছবে না, সে গৃহকে মান্‌লেও

হয়, না মান্‌লেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বল্লে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম্মশেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখেনা, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য্য আমাদের থাম্‌তে দেয় না;—কিন্তু দুর্গতির পূর্ব্বে দেখ্‌তে পাই মানুষ বল্‌তে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম্ম সে বিসর্জ্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কি করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায় সেই কথাই সে ভাব্‌তে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিষটা যে কেবলি সরে, কেবলি সরায়। এখানে হয় সরতে থাক, নয় মরতে থাক। এখানে যে বলেচে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধ্‌ব সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড় বড় জাতির মধ্যেও দেখ্‌তে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্ম্মনীতিকে দুর্ব্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা

হয় সে কারো অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলি উন্নতি, কেবলি গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! একথা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু একথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বল্‌তে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্চে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে

আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে ত সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মত এতে আমরা বিনষ্ট হইনে। তার কারণ আমরা পূর্ব্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরো গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার

দরুণ তিনি আমাদের কাছে ছোট হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কি বল্‌ব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"—ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনো-কালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারত-বর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

●

সেইজন্যে মৃত্যুর দিক্ থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড় বলে ত বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড় করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহঙ্কার করবার কিছুই রাখেনি সেই ধন্য—কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

"জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান॥
২৫শে পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্চে—সৌন্দর্য্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করচে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমুহূর্ত্তে সমগ্র করে দেখ্‌তে পাইনে। প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখ্‌তে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি

পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোট করে এবং নিকটকে বড় করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড় করে ও দূরকে ছোট করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপ্সা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এই জন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ঙ্কর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখ্‌ছিলুম। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্ব্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা

বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব —এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্য্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আস্‌তে হচ্চে। এমন কি, তার যথাসর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মত জান্‌ত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাক্‌বেনা সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

একথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে

একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক্ থেকে এসে তার মর্ম্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জ্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত ;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলি বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং

আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক্ আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক্ আমি একাধিপত্য করি। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্ম্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্ম্মের পাঠ একেবারে তুলে দেয়, নানা-প্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্ম্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়; মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিক্‌কে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬শে পৌষ

কর্ম্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্ম্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংশ করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এ'কে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম। যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্চে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করচে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করচে তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ ?

এক দিকে কর্ম্ম আপনিই হচ্চে, আর এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বল্‌তে পারিনে, তেমনি তাঁর কর্ম্ম মাকড়ষার জালের মত শামুকের খোলার মত তাঁর নিজেকে বদ্ধ করচে একথাও বলা চলে না।

এই জন্তই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বল্‌চেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্চে।

কর্ম্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে

হয়, আর প্রাচুর্য্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয়, বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যে কর্ম্ম করি সেই কর্ম্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে ত বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্ম্মই মুক্তি।

এই জন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্চে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্ম্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্চে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্ম্মের মধ্যেই তিনি মুক্ত স্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্ম্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা

নয় সেই কর্ম্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্ম্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্ম্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্ম্মে। সমস্ত কর্ম্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্ম্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ

Imp 4109 . dt - 8.9.09

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারে কর্ম্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম্ম অন্ধকার এবং কর্ম্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ তাকে নাস্তিকতা বল্লেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্চে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জ্জিত করে দেখ্‌লে সমস্তকে ত্যাগ করা হয় সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হোক্‌ আনন্দের ধর্ম্ম যদি কর্ম্ম হয়

RARE BOOK

তবে কর্ম্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় এ'কেই বলে কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্চে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্ম্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্ম্মকে তিনি স্বামীর কর্ম্ম জেনেই আনন্দবোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মত এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম্ম তাঁর পক্ষে কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্চেন।

আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এই কর্ম্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন

হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—"মৃত্যুং তীর্ত্বা"—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জ্জরিত হতে থাকবেন—তিনি "যদ্যৎকর্ম্মপ্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" —যে যে কর্ম্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন, কারণ, কর্ম্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দসাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্ম্মের আসক্তি দূর করে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা

বিসর্জ্জন করে কর্ম্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" কেই ব কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত—জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭শে পৌষ

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সঙ্গত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘট্‌লেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌বে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জ্জন করে নিয়মের ঊর্দ্ধে উঠ্‌ব তা হলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে' তবেই

বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মান্‌তে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বল্‌ছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারি—কর্ম্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্ম্মের চেয়ে বড় হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য কর। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন্ তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" শুনেছি এর পরমাশক্তি এবং এঁর বিবিধাশক্তি—এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্চে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করচেন, তাঁকে কেউ করাচ্চে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্ম্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্ম্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্ম্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্ত্তিবশত।

সেই কারণে কর্ম্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্ম্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন

ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনি সে চলে যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনি সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম্ম যখন স্বার্থের সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্ম্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্ম্মা স্বার্থপর, জগৎ-সংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানচে এবং

এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মত আয়ত্ত করে রাখ্‌বে এমন সাধ্য তার নেই; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্ম্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্ম্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্ম্মই করি—তা ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্ সেই পরামাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখ্‌লে সেই কর্ম্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম্ম সত্যকর্ম্ম, মঙ্গল কর্ম্ম এবং আনন্দের কর্ম্ম হয়ে উঠ্‌বে।

২৮শে পৌষ

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ—ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান্।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্ম্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধটুকু তুল্‌লেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী"

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্চেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম্ম এই দুটো জিনিষ একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের

সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করচেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না ত, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্ম্মও কর্ব্বেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি ত শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা ত নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বল্‌লে তাঁর আনন্দ বাঁধ মান্‌বে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বল্‌তে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বল্‌তে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা,

স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্ব্বতো-ভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বল্‌চেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝঙ্কৃত করে তিনি বল্‌ছেন—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্ম্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বল্‌চেন, আপন অমৃত সঙ্গীত বল্‌চেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বল্‌বেন তখন আর-কেমন করে বল্‌বেন? তাঁকে কর্ম্মের দ্বারাই বল্‌তে হবে? তাঁকে ক্রিয়াবান্ হতে হবে।

সে কর্ম্ম কেমন কর্ম্ম? না, যে কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ"

পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্ম্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্ম্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলচেন—"শান্তম্ শিবম-দ্বৈতম্।" জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করচে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্ম্মে উচ্ছ্বসিত হচ্চে, বাহিরের সেই কর্ম্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্চে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সুন্দর আবর্ত্তন চলচে

এবং সেই আবর্ত্তনবেগে নব নব মঙ্গল লোকের সৃষ্টি হচ্চে। সেই আবর্ত্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্চে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠ্‌চে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণ-রূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্ম্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজ্‌তে থাকুক্—কর্ম্ম সঙ্গীতে বাজ্‌তে থাকুক্—তোমারি নামে বাজ্‌তে থাকুক্! প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় ত সেও ভাল কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক্, গভীর হোক্, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে

সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক্—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হোক্!

২৯শে পৌষ

——

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্ম্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্ব্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্ম্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে

একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বল্লেন অথচ কর্ম্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড় পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোট সে কথাও নানারূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নির্গুণ দিক্ এবং একটি সগুণ দিক্ দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্য থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক্।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করিনি। তখন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুসি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্চে তা এমনি একতরফা হচ্চে যে আমার দিক্ থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্চে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলি সকলের হাত পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বল্‌তে হয় তুমি দয়া করে জ্বল, বাতাসকে বল্‌তে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্য্যকে বল্‌তে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচেনা। "অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"—যেখানে ব্যবস্থা

দেখ্‌তে পাইনে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না—কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবী নেই—সেটা একেবারেই এক তরফা জিনিষ।

অথচ যার সঙ্গে এতবড় কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও ত কোনো নিয়ম থাকৃতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুক্‌তাক্ বলে তাই সে আঁক্‌ড়ে থাকৃতে চায়, সেই তুক্‌তাক্ যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই ত বোঝাতে হয়! কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ী থাকা। সেও আবার এমন পর যে

খামখেয়ালিতার অবতার। হয় ত পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয় ত হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনি ঘর ছেড়ে বেরতে হবে।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগুনে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্য্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেন না, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারি। তার নিজের যে আলোক

সর্ব্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্ব্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাক্‌লে সে নিজেই বা কোথায় থাকৃত!

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর ত বাধা পেল না। সে বল্‌ল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন! আর ত আমাকে সঙ্কুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাক্‌তে হবে না! এতদিন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম যেন কোন্‌ পাগ্‌লাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন সমস্তই আমার আপনার।

এই ত হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা তাবিজের শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন

সেই পরিচয়ের উপরেই ত চুপচাপ করে বসে থাকতে পারিনে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্ব্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায় —কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে' আর চুপ করে' থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্ম্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্ম্মের দ্বারা সে নিজেকে

দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জ্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মত থেকে কেবলি বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তি-কেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্চে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্ম্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্ম্মই হতে পারবে না।

তা কি করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্চেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেই জন্যেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্ব্বতীর মত তিনি তপস্যা করচেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন

তখনি আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয় —তারও পরের কথা হচ্চে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জ্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্তই বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই ত তাকে মুক্তি বল্‌ব—নিগুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১লা মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাব্‌তে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে—মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় তত খানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেষ্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড় বড় উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ

হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানব হৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজন-ওয়ালা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে ত কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্ত্তি দেখেই ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়। ম্যাঞ্চেষ্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কি!

আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব! বাণিজ্যের জাহাজ দেশবিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাক্‌ব!

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এতবড় স্পর্দ্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্ খানে? প্রেমে। যখনি জান্‌ব প্রয়োজনই মানব সমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্ত্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনি বলে উঠ্‌ব—প্রেম! আঃ বাঁচা গেল! তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারি জিনিষ। এ ত আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে ত আমারি তত্ত্ব।

অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্ত্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই ত গেল মুক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্চে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার ত ওজর নেই। সে ত বল্‌তে পার্ব্বেনা, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই যেখান থেকেই ডাক পড়ে তার আর না বল্‌বার জো নেই। মুক্তির এত বড় দায়। আনন্দের দায়ের মত দায় আর কোথায় আছে!

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদ্‌চে। সে বল্‌চে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত, গর্ব্বিত, স্বতন্ত্র সেই খানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও! যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্চে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কি ঘোরাই ঘুরেছি! আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি! যখনি স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছো—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনি এক মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু ত মুক্তিলাভ নয়।

আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চেনা, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করচে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়েচে; স্বার্থ আরাম, অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এ কথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্ত্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে

তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই— ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল-সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা

করে বেরই ; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে-উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মত হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্য যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেই রকম নানাপ্রকার

আয়োজন করে। যাঁরা ভাল করে বল্‌তে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে, রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ রস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে' ভুল করা মানুষের দুর্ব্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানা প্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে' মানুষকে ভাই বল্‌তে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয়—এবং সেইরূপ ভাব অনুভব ও ভাব প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ঐখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলিনে। কিন্তু এ-কেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তাহলে

এই জিনিষটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ, এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দু'টি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্চে, কখনো রৌদ্র উঠ্‌চে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্চে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইচে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারি থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্চে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়চে—আবার নতুন পাতা উঠ্‌চে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত

স্তব্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করচে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকেই নেওয়া হচ্চে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্চে চরিত্রের দিক্, এটা ভাবের দিক্ নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই—সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড় অলক্ষ্য বড় গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না—সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা—সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলি গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবচে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মত সকলের নীচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্ত্তন। আজ তার যে কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলচে—কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মত তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠচে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নবনব ভাব-সংস্পর্শের জন্ম ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও

বিনাশেরই কারণ হয়। যে গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্য্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্ব্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই;—সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়চে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের থেকে বর্ষিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিষ, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বল্‌ব—তোমার পায়ের ধুলো নিলুম—আমার ললাট নির্ম্মল হয়ে গেল—আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল—প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্ম্মে নির্ম্মল সতেজভাবে তার পরিচয় বহন করব।

২রা ফাল্গুন, ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্য, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদান প্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, কত লীলা-খেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেম-বশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক

একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখ্‌তে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে;—নানাপ্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে কথা আর চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্তে দান করে' নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সম্বরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুসি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে—সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চ্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কিরকম অপরিমিত-রূপে বেড়ে উঠ্‌তে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখ্‌লে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন—কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়-দৌড় এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চল্‌চে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরচে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে কিন্তু

আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানিনে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাৎ। আমরা মানুষের জন্য যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্যদিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখ্‌তে পাই আমাদের গভীর-তর চিত্ত কেবলি নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না; তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলি তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চল্‌তে হয়—কোথাও থাম্‌তে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এই জন্য যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের

জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্ব্বতে নির্জ্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান—শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জ্জনতা এই পর্ব্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব?—সে ত সব সময় জোটে না।—এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও ত মানুষের ধর্ম্ম নয়।

এই নির্জ্জনতা এই পর্ব্বতগুহা এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে—আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকৃত তাহলে নির্জ্জনতায় পর্ব্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্চি—বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ, মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্চে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্ম্মলুব্ধ লোককে দেখ্‌তে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলি মানদণ্ড হাতে করে হিসাবী কৃপণের মত খর্ব্ব করচে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলি শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করচে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না—আর যাই হোক্ মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে—উদ্দাম-ভাবে বেহিসাবী হলেও চলবেনা, কৃপণভাবে হিসাবী হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের এক-মাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারম্বার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে যখন-তখন ঘোর-তর কাজকর্ম্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেই-খানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্ব্বদা

ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ ত কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্চেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখ্‌তে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে, সর্ব্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করচেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করচেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জ্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস কর— শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড় ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই জান; যখন হাস্‌চ খেলচ কাজ করচ তখনো একবার সেখানে যেতে যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাৎ হয়ে

উল্‌টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়োনা। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাক্‌লে তবেই সংসার আর সঙ্কটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠ্‌তে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠ্‌বে না।

"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,
অন্য কথা ছাড় না।
সংসার সঙ্কটে ত্রাণ নাহি কোনমতে
বিনা তাঁর সাধনা।"

৩রা ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি—"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে!" এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এই জন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে

ফিরচে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠ্‌ত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টি পাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কি বল্‌বে, লোকে কি করবে সেই অনুসারেই আমাদের ভালমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এই জন্য লোকের কথা আমাদের মর্ম্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে,—লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এই জন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে

আমার আর কেউ নেই—তখন আমরা এ কথা বলবার ভরসা পাইনে—যে

"সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে !"

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করেনি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মত আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করচে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি; আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে নিচ্চে—কত

অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই ;—যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করচে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখ্‌চে ; সুখসমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্চি ; একবার খবরও রাখিনে যে অন্তরাত্মার অচল্ সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই ত সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করচি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারচিনে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলি সঙ্কীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্চে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বল্‌তে হবে—"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে।" নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই

সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখ্‌তে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবেনা। যখন জান্‌ব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে,তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়ম পালন-মাত্র হবে না। যে পর্য্যন্ত তা না হয়, যে পর্য্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে পর্য্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে—সে পর্য্যন্ত কেবলি বল্‌তে হবে—

"ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে
অন্য কথা ছাড়না!

তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১লা মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক একটি মতবাদকে

আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোট এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্যে সত্যকে বারম্বার মতদেহ পরিবর্ত্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানা প্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘট্‌তে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা, যে, কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায়

আমরা ভীত ও পীড়িত হইনে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানাদেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করচে এক একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্যআত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহলেই সত্যের অমৃত স্বরূপ জান্‌তে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলি মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহঙ্কার সুতীব্র হয়ে উঠে' জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে' সত্যকে যতই দূরে ফেল্‌তে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমা-

দের ধৈর্য্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্য্য হরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্য্যন্ত এক-ঘরে' করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ কর! তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুন্‌লেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানিনে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বল্‌চে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি-লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে একেবারে পর্য্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্ত্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্য্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরি-সমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বল্‌চি এ'কে

অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য্য থাকৃত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করচে একদিকে আচ্ছন্নও করচে। যেদিকে আচ্ছন্ন করচে সেদিকে তাকে কি বল্‌ব? তাকে মায়া বল্‌ব না কি, মিথ্যা বল্‌ব না কি? তবে "মিথ্যা" শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্তও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই শুদ্ধ শান্ত গম্ভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতি-লাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাইনে।

কেননা, আমি যে অনুভব করচি, মিথ্যার

বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেল্‌তে পারিনে! অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে! মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ।"

নিজের অহঙ্কারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টান্‌ব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জান্‌চি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎসম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্চে না? সেই ভ্রমই কি

আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করচে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়ষার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহঙ্কারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জ্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি!

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মত থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌চে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে! আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—"একমেবাদ্বিতীয়ং!"

২রা মাঘ

নির্ব্বিশেষ

সংসার পদার্থ টা আলো আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ শক্তি বিপ্রকর্ষণ শক্তি, কেন্দ্রানুগশক্তি কেন্দ্রাতিগশক্তি কেবলি বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখ্‌তুম—শান্তিকে কোথাও : কিছুমাত্র দেখ্‌তুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে

অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চল্‌তে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চল্‌লে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাক্‌বে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে ·সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এইপ্রকার সোজা লাইন থাকৃতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চল্‌তে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টান্‌তে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চল্‌তে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বত্ব নেই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব্ব পশ্চিমের

মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্ব্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিষটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কি নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনি ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌তে যাই তখনি এ'কে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্ব্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অদ্বৈতের বিরাট্ সাধনা, ছোট বড় নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। এ'কেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জান্‌ত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহঙ্কারকে যথন একান্ত বিশেষ করে জানে তথন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্ম্ম করতেই পারে। মানুষের ধর্ম্ম-বোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্চে তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চল।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট

মূর্ত্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অটাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারিনে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড় বড় ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্ম্মভাব কত রকম করে কাজ করচে। বড়র মধ্যে ছোটর বিশেষত্ব গুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জন্যে বড়র মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড় ভাবের আনন্দে ছোটর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্চে নির্ব্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করচে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের

এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদদান করেছে—তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্দ্ধব্যক্তভাবে যে সত্য কাজ করছিল; সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হোক্ বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে সয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে ত কোনমতে মনেও করতে পারিনে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত যা কিছু

হচ্চে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্ব্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছন যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে পারে না। কর্ম্ম তখন আনন্দের কর্ম্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্ম্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩রা মাঘ

দুই

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধ
মপাপবিদ্ধং
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসচিঃ—

"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।"

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তাউদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করিনি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখ্‌তে পেতুম। "তিনি সর্ব্বব্যাপী" এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—"স পর্য্যগাৎ"; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞা গুলি "শুক্রং" "অকায়ং" প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েচে। দ্বিতীয়তঃ, শুক্রম্ অকায়ম্ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ "কবির্ম্মনীষী" প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের

দুই

শরীর নেই এই পর্য্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বল্‌লে এক ত বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত-করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক্ দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারিনি।

আমি সে জন্যে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিষকে তখনি লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্ব্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্ব্বে আমি দেখ্‌তে পাইনি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্চে "পর্য্যগাৎ" তিনি সর্ব্বত্রই গিয়েছেন সর্ব্বত্রই আছেন—আর একটি হচ্চে "ব্যদধাৎ" তিনি সমস্তই করেচেন। এই মন্ত্রের এক অর্দ্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্দ্ধে তিনি করচেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ পদ, যেখানে করচেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ, অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্ব্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখ্‌তে হয়। তিনি যে

কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্ব্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্ব্বত্র নেই। শুধু সর্ব্বত্র নেই তা নয় সে সর্ব্বত্র নির্ব্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্ম্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুণ কি বলা হল তা ঐ অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই ত গেল সপর্য্যগাৎ।

তার পরে স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্য্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করচেন এবং নিত্য কালের জন্ত বিধান করচেন। সে বিধান কিছু-মাত্র এলোমেলো নয়—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করচেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কি? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্ব্বদর্শী কথাটা ঠিক চলেনা। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখ্‌চেন তা নয় তিনি করচেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করচে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখ্‌লেই টের

পাওয়া যায়। জগৎ প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনাআপনি যেমন তেমন করে একটা কাণ্ড করচে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্চেন পরিভূঃ—কি জগৎ-প্রকৃতি কি মানুষের মন সর্ব্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর এই কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্চে না তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্ম্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য দুইবাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও

সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাতথ হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্ব্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাক্‌বে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাক্‌বে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুল্‌বে—মনকে রাজ্য করে তুল্‌বে—বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে; অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভূত্ব সুস্পষ্ট হবে—অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম্ম কেমন মিলিত হয়েছে—হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভু আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বহুধা হয়ে উঠেছে—বিশুদ্ধ নির্ব্বিশেষ

বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন—যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করচেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ঐ একটি ছোট মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ঠা মাঘ, কলিকাতা।

বিশ্বব্যাপী।

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ—
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায়
নমোনমঃ।—

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ একথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, "তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারিনে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়—একথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু একথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বল্‌তে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলেনা—এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিষকে আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিষটা যে কেবল নিজে

ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের সামিল হয়ে ওঠে। কেরাণী তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বল্লেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানা প্রকার, সুবিধা ঘট্‌চে তবে, সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখ্‌তে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলঃস্থল বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহঙ্কৃত

হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড় করে পেতুম তাকে ছোট করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ করে দেখেননি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মত গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী এই জ্ঞানকে

সর্ব্বত্র সার্থক কর—যিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক্।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখোনা, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ কর—দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্দ্ধে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ কর—তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্চে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্ব্বব্যাপী ধীকে ধ্যান কর—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ কোরোনা। সমস্তই আশ্চর্য্য, সমস্তই পরিপূর্ণ;—নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্ব্বত্রই মাথা নত হোক্ হৃদয় নম্র হোক্, এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক্; যাকে বিনামূল্যে পেয়েছি তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ কর, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ্ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও!

"য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়

নমোনমঃ”—পূর্ব্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোট করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল ?

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি—একথা বল্‌তে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে ঋষি বলেছেন, তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন—সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর

তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে স্নান কর্ত্তেন সে স্নান কি পবিত্র স্নান, কি সত্য স্নান, তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কি অমৃতের স্বাদ ছিল—তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্য্যোদয় কি গভীর গম্ভীর কি অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্য্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চল্‌বেনা—কবে বল্‌তে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ই মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদেরও অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের

সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত—এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ—এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম্ম অতি বিচিত্র—এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হননি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হননি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল— মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেননি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে

সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু না কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই—তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্চে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে

আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকেনা। তাঁর পার্থিবজীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেই জন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্ম্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এই জন্য তাঁর মৃত্যু দিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃত জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে দিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল—

মৃত্যুর প্রকাশ

৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না— তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি—সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ই মাঘ কলিকাতা

শান্তিনিকেতন

(পঞ্চম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

নবযুগের উৎসব	১
ভাবুকতা ও পবিত্রতা ...	২৮
অন্তর বাহির	৩৫
তীর্থ	৪৪
বিভাগ	৫১
দ্রষ্টা	৫৯
নিত্যধাম	৬৩
পরিণয়	৬৭

BENGAL LIBRARY
29 APR
WRITERS' BUILDINGS

শান্তিনিকেতন

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করছি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানেনা যে, মানব জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র;

সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানেনা। তবু একথা একদিন তাকে জান্‌তেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ কর্‌বার জন্যে পালন করচেনা—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠ্‌চে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আস্‌চি। আমরা কি কর্‌চি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের

ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বল্‌তে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত

হবেনা ; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বল্‌ব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বল্‌বনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি ; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব ; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ —
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল

আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারেনা। মহান্তম্‌ পুরুষং—মহান্‌ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাক্‌তে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝ্‌খানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক্‌ আর পণ্ডিতই হোক্‌, সে রাজচক্রবর্ত্তী হোক্‌ আর দীন দরিদ্রই হোক্‌, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যে দিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সে দিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃত-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সে দিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন—সে দিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "বেদাহং", আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃত-

যজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণ-ধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগ্‌ল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আস্‌তে থাকে তখন যেমন দেখ্‌তে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূর-দূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে

সম্পদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বত-শিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজ্‌তে থাকৃত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে—সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ

সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা ;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়, —সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহাঃ"

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা !" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল্‌চে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘট্‌লে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বল্‌তে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বল্‌তেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে "বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতি-

র্য্যয়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌ছিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখ্‌ছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার; সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বল্‌চে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও! সে বল্‌চে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত "না" দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি

সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জান্‌লে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জান্‌লে, নিম্ন দেশ যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও—এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

নবযুগের উৎসব

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বলচে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "একসূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়

—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও —শৃণ্বন্তু বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো— পূর্ব্বগগণের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে— বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃ-পরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ !"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আস্‌চে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা – সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন

যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করছিলেন - এক! এক! এক! তিনি বল্‌ছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে

প্রচার করতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে!

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠ্‌ল তখন এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

আমাদের দেশে আজ বিরাট্ মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর

গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধর্‌তে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এই খানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক!

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখচি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেচেন, আর আমরা সুস্থির থাক্‌তে পারচিনে! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আস্‌চে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে

উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এম্‌নি আমাদের মনে হচ্চে। কেননা কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে দেখ্‌ছি বাতায়নে এক-এক-জন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন;

তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহাসঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার ফিরিয়ে আনতে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং!

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমা-

দের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলেনা যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে "একোবশী সর্ব্বভূতা-ন্তরাত্মা," সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ; আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায় ; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নি-হিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না ; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক ! তবে আমরা আর এ স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক

লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্ব-লোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভা-তের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমা-দের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের! না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন

করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে–বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে! —বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনোনা, দুর্ব্বল বলে

মেনোনা—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরোনা—সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্ম্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্খানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচচেনা,

সংসার সঙ্কটে ত্রাণ নাহি কোনো মতে
বিনা তাঁর সাধনা।"

কেন না, সংসারকে একমাত্র জান্‌লেই সংসার সঙ্কটময় হয়ে ওঠে—তখনি সে অরাজ অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্ব্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অন্তরে এস! সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক্, কোনো আঘাত না পৌঁছক্, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক্—সেখানে ক্রোধকে পালন কোরোনা, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়োনা, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখোনা—কেননা সেই খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব মন্দির; সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবেনা—সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্য স্থানের ফটক বন্ধ! এস সেই অক্ষুব্ধ নির্ম্মল অন্তরের মধ্যে এস—সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরি-

শিখরে এস—সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার কর—সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও, সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ঠা ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভাল রকম না হলে ঐক্যটিও ভাল রকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে তখন তার মধ্যে একের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড় বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্চে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ—যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দ্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্য্যে সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্র মহল ; স্বার্থপরমার্থ নিত্য অনিত্য সমস্তই আমাদের ঐ এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই—সেই জন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে জিনিষটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখ্‌তে হবে তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয় সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিষ যাতে বাহিরেই থাক্‌তে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকেনা। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না,

তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন ?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে,—কিন্তু সে ত বাইরেই ঝরে পড়ে যায় ; সেই তার বাহিরের অনিবার্য্য ক্ষতিকে গাছ তাব মজ্জার ভিতরে ত পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহত ভাবে চল্‌তে থাকে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করিনে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামী বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপ-কল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখ্‌তে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহালে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম্ম আছে—সেখানে জমা করবার

জায়গা। এই জন্যে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিষ নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃত দেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুইটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের—অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেই জন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা

প্রয়োগ করে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখ্‌তে ত্রুটি করে না। তার অন্তর প্রকৃতি না কি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জন্যেই তার এই সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে—প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এই জন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে জিনিষটা অন্ন-সংগ্রহ-চেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত করা তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্ত্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্য-নিকেতনে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্চে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং ল্যাজটা কেতু আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্চে।

আমাদের যে অন্তর ভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার

দ্বিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সঙ্গতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্ম্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট—সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্ব্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে—তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত ত দাসের বেতন নয়—সে যে দেবতার পূজার ভোগ সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে

গিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌লেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বল্‌ছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ই ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখোনা। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্ম্ম-সংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব কোরো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বারম্বার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মত দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁছচ্ছে না। সেখানে শান্ত স্তব্ধ নির্ম্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না।

এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহাজনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এসো সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অক্ষুব্ধতরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছয় না, ক্রোধের গর্জ্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্ব সংসারে এমন কিছুই নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নয়। এই জগৎ তাঁরই বটে তিনি এর সর্ব্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর ;—এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার,

শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে' বিশেষ নাম ধরে' নানা সুখ দুঃখ ভোগ করচে এই তাঁর ·বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্চেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি—তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ দুঃখের অতীত হয়ে যাই—নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্ম্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং।" নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পরম কোষকে জান্‌তে

পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারম্বার বলেছেন, "অন্তরাত্মাকে জান তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরমকে জানবে—তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছুই পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

৬ই ফাল্গুন

—

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জান্‌ব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখ—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত—সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখ—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে একমুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ কর—সেইখানে তাকাও—তাহলেই ব্রহ্মের আনন্দ

যে কি, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে—এবং তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধি-ব্যাধি জরা মৃত্যু বিচ্ছেদ মিলন, যেখানে আনা-গোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলি যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলি কার্য্য থেকে কার্য্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলি শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয়

হচ্চে বিনাশ হচ্চে—এমনি করে বারম্বার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে দেখ—তা হলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে—তা হলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী! আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত—আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত—সেই জন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা "ন বিভেতি কদাচন।"

"পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।"

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে মুক্ত

করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা "শোচতি শোচতি শোচত্যেব।"

৭ই ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখচি—সৃষ্টি-ব্যাপার চল্‌চেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্চে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্চে—আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে—এক মুহূর্ত্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিষই পরিণতির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিষেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর বুদ্ধি মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরচে—ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্য্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্চে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখিনে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি—যেন এক আয়-

গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্চে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছতে পারচিনে? আমাদের অস্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো অর্থই নেই।

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাঁকে কোনো

কালেই পাবনা তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে? তাহলে এই কথাই বল্‌তে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও ত পাওয়া যায় না। সংসার ত মায়ামৃগের মত আমাদের কেবলি এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা ত দেয় না। কেবলি খাটিয়ে মারে ছুটি দেয় না—ছুটি যদি দেয় ত একেবারে বরখাস্ত করে;—এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। শ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ—অর্থাৎ সে কেবলি আমাদের চালাবে—খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে—মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে—চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ—যখন না চল্‌ব তখন খাওয়াবেও না, আস্তাবলেও রাখ্‌বে না, ভাগাড়ে ফেলে

দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না—ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্চে—ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চল্‌তেই হবে; সে মূঢ়ের মত কেবলি নিজেকে প্রশ্ন করচে, কোনো কিছুই পাচ্চিনে, কোথাও গিয়ে পৌঁছচ্চিনে তবু দিনরাত কেবলি চল্‌চি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়চে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়চে কোথাও স্থির থাকৃতে দিচ্চে না—এর অর্থ কি?

যাই হোক্ কথা হচ্চে এই যে, সংসারকে ত কোনো খানেই পাচ্চিনে—তাব কোনোখানে এসেই থামচিনে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মত? তাঁকেও কি কোনো খানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলি কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই--সংসারের তত্ত্বই হচ্চে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্চেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করচি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্চি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলচি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করচি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলেনা

—তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়—সেখানে ক্রমশঃ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বল্‌চেন—

"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেই খানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীর ভাবে অবস্থিত জানেন তাঁহার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দ্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই; তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং

জ্ঞানমনন্তংরূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন এইটি ঠিকমত জান্‌লে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এই জন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাইনে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেন না তিনি এ'কে স্বয়ং বরণ করেছেন; কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে! বলা হয়ে গেছে "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্য" "এষ।" হয়ে আছেন; তিনি এর এক হয়ে বসেছেন—নাম করবার জো নেই। তাই

ত ঋষি কবি বলেন—"এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ !"

পরিণয় ত সমাপ্তই হয়ে গেছে—সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানা রকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভাল করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই ; সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যে, যিনি সত্যং-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মত গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। এই খানেই নিত্যের সঙ্গে

অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এই খানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্চি;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্চি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্চি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই "আনন্দংব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখেনি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে, যেখানে তার রাণীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে—ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং
ভয়াৎভয়ং।

[illegible]ই ফাল্গুন ১৩১৫

BENGAL LIBRARY
29 APR

শান্তিনিকেতন

(ষষ্ঠ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

14. SEP. 10

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

তিনতলা	...	...	১
বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল		...	৭
স্বাভাবিকী ক্রিয়া ...		...	১৫
পরশরতন	...	...	২০
অভ্যাস	...	...	২৬
প্রার্থনা	...	...	৩৪
বৈরাগ্য	...	...	৩৯
বিশ্বাস	...	...	৪৭
সংহরণ	...	...	৫৫
নিষ্ঠা	...	...	৫৯
নিষ্ঠার কাজ	...	...	৬৪
বিমুখতা	...	..	৭০
মরণ	...	...	৭৯
ফল	...	...	৯২

BENGAL ... 29 APR ... WRITERS' BUILDINGS

শান্তিনিকেতন

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখ্‌তে পাই। তিনটে বড় বড় স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে, একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্ম্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রই হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকৃতে পারি না—আমাদের মনের জিনিষগুলিও

আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখ্‌তে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে,' অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে' আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই সামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসন-গুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কি রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা মনের দ্বারা কল্পনার দ্বারা ভয়ের দ্বারা

ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানা রকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্ব্বের মত একমাত্র বলে মনে হয় না—তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, এক মাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ্ বলে আর জানিনে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই যখন আমরা তার সীমা দেখ্‌তে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল—তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগ্‌লুম, সংসারকে একেবারে সর্ব্বতো-ভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বল্‌তে লাগ্‌লুম, যার মধ্যে কেবলি আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মত অনন্ত প্রদক্ষিণ তাকেই

আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্‌।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে প্রবৃত্তিগুলি এত দিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্ব্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নির্ম্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজস্থয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজাকে হার

মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখ্‌লুম, পূর্ব্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্য্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে একি দেখি? এ ত জয়গর্ব্ব নয়! এ ত কেবল আত্মশাসনের অতি বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়! বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ ত কেবল অন্তরের নিয়ম বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্ম্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে—অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্চে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে

গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ—তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা—তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব,—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা অহঙ্কারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্ম্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ই ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্ম্ম চেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সব প্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক্ দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগ্‌ব এইজন্যে যে, নিজের চৈতন্যময় কর্ত্তৃত্বকে অনুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাষ্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাষ্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে' তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া—রাজা যে কারো দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্চে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাষ্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানাপ্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাষ্টারের 'প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে, যে বড় হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাষ্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সে আমাদের চেপে পড়বার জো করে তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্চে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার

সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্চে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না,—বাহিরই কর্ত্তা হয়ে থাকে; কোনোপ্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিষকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিষটা অন্তরের জিনিষ। ইচ্ছা

আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না—সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারদিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কি হয়? না, যে সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সম্বরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সে জন্যে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে

চায়—তাহলেই বাহিরের কর্ত্তৃত্ব বড় হয়ে ভিতরের কর্ত্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কুল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছা শক্তি বলিষ্ঠ—কর্ত্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিত্তার ঐশ্বর্য্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জ্জগতে বিচিত্র—তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও ত অন্তর্জ্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিত্তার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠ্‌তে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে ত কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাস্তাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে বেতন মিল্‌ত তাতে ত পেট ভরত না। সেই জন্যেই মানুষ বারম্বার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড় দুঃখের চাকরি। এ'তে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনো ত অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলি উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এই জন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা—সে রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখ্‌তে পারনা তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভাল বটে কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য—এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সম্রাজকতার পরম কল্যাণ কখন্‌ উপভোগ করি? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সঙ্গত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা—মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়—সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনি তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্য্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল—অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম—তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম—সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম—রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

১১ই ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করচে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন— "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তাহা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহঙ্কার তাকে ঠেলা দেয় না, লোক সমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে

আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়া শক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার কর্তে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত! তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেই জন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেই জন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও

চলচে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসার-তাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্ব-কল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলচে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্চে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করচে—তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন —কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্য্যশালী রাজ-ধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জ্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র য়িহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল—যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি

অনায়াসেই ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায়নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়! ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত ক্লশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করচে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারম্বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্ব্বল, সেই শক্তিকে

আশ্রয় কর, সেই ক্রিয়াকে লাভ কর—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষা-পাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ কোরো না—তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্য্যকে লজ্জা দেবে।

১১ই ফাল্গুন

পরশরতন

"তাঁর নাম পরশরতন
পাপি-হৃদয় তাপ হরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।"

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুল্‌তে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্ম্মকে স্পর্শ করতে হবে।

তাহলে, যা হাল্কা ছিল একমুহূর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকাল বেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করবনা—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করবনা—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়—তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্যে আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়া-তেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনি স্নিগ্ধতার

দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনি বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তখনি আপনাকে হারিয়ে ফেলি ;—আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি—সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মত মন্দিরেরই পূজার্চ্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো থাকেনা—তাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়ত আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশ

কালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনো যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনি মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি "ভূর্ভুবস্বর্লোকে," মনে পড়ে যে, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করচেন, মনে পড়ে যে, সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে' পেয়ে

বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরো বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিষটা বাইরের ক্ষণিক জিনিষ, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটকে বড় করে তুল্‌ব না, শ্রেয়কে প্রেয়ের আসনে বস্‌তে দেবনা এবং সকল সময়ে সকল কর্ম্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চল্‌তে দেব—তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝ্‌তে দেবনা—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম্ম আমাদের বিষয় আশয় যা

কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও—আপনিই সমস্ত বড় হয়ে উঠ্‌বে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে—সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ই ফাল্গুন

—

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্ম্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সত্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হোক্। সেই জন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চল্‌চে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরি-সমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হোক্ বিলম্বে হোক্, সে জন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্চেন না;—সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠ্‌বে।

সেই জন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে ত আনতে পারিনে—তবে এ কাজটি কি আমাদের ভাল হচ্চে? নির্ম্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করচিনে?

আমার মনে এক এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়,—মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি—পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি—কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে—পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে।

উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন পাছে এই তাগিদ-টাই সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে! সেই জন্যে এক এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কি জিনিষ তা যে জানি। এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কি প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে সময়ে আশ্র-য়ের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ! তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন; চারদিকেই তাকে টানা-টানি করে মারে;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সুর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ, তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে

এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই—ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্ম্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না ;—সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সঙ্কোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চল্‌বে না—একদিনও ভুল্‌বো না, প্রতিদিনই তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই হবে—প্রতিদিন কেবল সংসার-কেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেবনা—দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড় তুমি সকলের চেয়ে বড়।

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন—কোনোদিন আমাদের মন কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগেনা—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না—দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব—দ্বার খুলুক্ আর নাই খুলুক্। যদি এখানে আস্‌তে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আস্‌ব—যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখ্‌তে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আস্‌ব।

কিছু নাই জোটে যদি তবে এই অভ্যাস-টুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে

জড়তা মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্ত-প্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা—দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখ্‌তে হবে—তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া! কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব এ ত কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে—যে, "পিতানোঽসি"—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করচি, তুমি পিতা, আমি স্বীকার করচি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আস্‌তে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্‌ তোমাদের কাজকর্ম্ম, থাক্‌ তোমাদের আমোদপ্রমোদ! আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতানোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে', তাঁর চন্দ্রসূর্য্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে—"ওঁ পিতানোঽসি"—এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখ্‌চি। এত বড় বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই এক্‌টুও স্বীকার করবে না—এ ত কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান কর, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধর—তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন কর—তাহলেই যে দয়া অযাচিত-

ভাবে প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্চে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে—এবং প্রত্যহ ঐ যে অল্প একটু বাতায়ন খুল্‌বে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেম-মুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ই ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি আছ যে—দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে' আস্‌চে—সত্যং! তুমি আছ—তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠ্‌চে—তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে' সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ম্ময়—আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—তোমার অনন্ত আকাশের

কোটি সূর্য্যলোকে সে জ্যোতি কুলোয় না—সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেল—আমাকে জ্যোতির্ম্ময় কর—আমার অন্ত সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি!

হে অমৃতস্বরূপ—আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ—সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ—গতিতে প্রাণে সৌন্দর্য্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না—অনন্ত আকাশে তাকে

আর কোথাও ধরে না! সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি—সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাওনি—সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই—কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু—আমি যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছি—তোমার অমৃত আহ্বান আমার সংসারের সর্ব্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক্—অতি দূরে চলে যাক্, অতি গোপনে প্রবেশ করুক্—সকল দিক্ থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই—ডাক্ দাও—ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা

আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেল—আমার আর কিছুই বাকি রেখোনা—কিছুই না, অহঙ্কারের লেশমাত্র না—আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলি তুমি, তুমি, তুমিময়! কেবলি তুমিময় জ্যোতি, কেবলি তুমিময় আনন্দ!

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক্—তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ কর—কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক্—শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্য্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক্—এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল—শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে—শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে—তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই—যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাক্‌বে—তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা

আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্—আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক—জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক—তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক্, হৃদয়কে পবিত্র করুক্, শক্তিকে মঙ্গল করুক্—তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদ-সঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক্—তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবন পথের সম্বল হ য় থাক। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনি রক্ষা পাব।

১৪ই ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি— আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ, পুত্রকে কামনা করচ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করচ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য্য হচ্চে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেই জন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহঙ্কারের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়ই ম্লান হয়ে থাকে—তখন তার সত্য স্ফূর্ত্তি পায় না। এই জন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে

নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হতে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌তে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখ্‌ছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এ'তে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয়

না, বিরক্তিবোধ হয়—এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মত। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্য্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখ্‌তে পায় —সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোট আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক—এই জন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজচে। আমার আমি যখন

পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কি ঘটে ? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন, পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুস্কিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষ্যে যে সেই বড় আমির কাছেই একটুখানি এগোলো তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না—সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আট্‌কা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলি জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এই জন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন আমরা যথার্থতঃ পুত্রকে চাইনে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিক মত বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন

উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি—তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না—প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়—তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম বলে, আমাদের সমস্ত মনকে কর্ম্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্য্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই

তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্য্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্য্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখ্‌তে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয়—সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্চে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়ই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়—তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথ রোধ করছিল—তারা

প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্ম্মল নির্ব্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সৎকার মন্ত্র হচ্চে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ন্নঃ সন্ত্বোষধীঃ—
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।

বায়ু মধু বহন করচে—নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করচে—ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক্, রাত্রি মধু হোক্, উষা মধু হোক্, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক্, সূর্য্য মধুমান হোক্!

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে—চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে—আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি—যা কিছু প্রকাশ পাচ্চে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ—কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্চি বলে আর অহঙ্কার করে না—প্রকাশ হচ্চেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ—সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই—মৃত্যু অন্ত সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১১ই ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড় বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্চে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাত-সমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্চে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরো অনেকেই আঁট্‌লান্টিক্ পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছতে পারত—কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না—তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাইনে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেনি যে সে সমুদ্রের

পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এই জন্য ধর্ম্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি—আমরা বলি এ'তে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিষটা কি? না, পুণ্য হচ্চে একটি হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন—কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু

সাধনার লক্ষ্যকে এই রকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না— সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্চে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কি এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারো কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চল্‌বে না—কেন না এটি কোনো ছোট

কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা—এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড় ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য্য এই চারিদিক!

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি—কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্য্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি এ'কে প্রতিমুহূর্ত্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যু এসে এ'কে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বঃর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন কর—কেন? এ সমস্ত কি জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল স্থল

আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্চে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জান্‌তে হবে।

আত্মাকে যেখানে জান্‌লে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্চিনে। এই জন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জান্‌তে চাচ্চি। তাকে কেবলি ঘর দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিইনে—এই জন্যে তাকে পাচ্চি আর হারাচ্চি, কেবল কাঁদচি আর ভয় পাচ্চি। মনে করচি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে

এবং ওটাকেই প্রধান করে জান্‌চি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে বহন করচি।

আত্মাকে সত্য করে জান্‌লেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দ্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহঙ্কারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জান্‌বে—সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্ম্মলতার মধ্যেই নিজেকে জান্‌বে। কামক্রোধলোভ যে সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্রনির্ম্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে

উঠ্‌বে—এবং সর্ব্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জান্‌বে। সে জান্‌বে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জান্‌তে পারবে সে চিরদিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখ, দেখ, নিরীক্ষণ করে দেখ, সমস্ত চেষ্টাকে স্তব্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখ। একটি চাকা কেবলি ঘুরচে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে

আছে সেই বিন্দুটিকে অর্জ্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেননি বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলি ঘুরচে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে—সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণা-গতির মধ্যে দেখা বড় শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখ্‌তে পারি।

১৬ই ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড় বাধা হচ্চে সাধনার অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয় ত আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে' এসেছে সেইটের মধ্যেই হয় ত আমরা আকৃষ্ট হয়েছি—যেমন-তেমন করে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেখানে সেখানে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে আমরা চলে যাচ্চি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চল্‌চে বলেই আমরা চল্‌চি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দ্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চ্চাই করি নি। এই জন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা

নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্ম্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এ'তে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে—তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখ্‌ছি একবার তার উপর রাখ্‌চি এমনি করে কেবলি টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার

কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজন গুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দ্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলি জমে উঠ্‌তে থাকে, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনে।

তাই বল্‌ছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থা-তেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ত-তাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যে টুকু সচেষ্টতা থাক্‌লে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে ক্ষয়ে গিয়ে থাকে তবে বড় বিপদ। যেমন করে হোক্, বারম্বার স্খলিত হয়েও

সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুল্‌তে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চল্‌তে শেখে তেমনি করেই তাকে চল্‌তে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চল্‌তে শেখা। স্থৈর্য্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৫ই ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্ত্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য! তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্ব্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্ত্তি ত নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও ত সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন ত আর ভাবনা থাকে না—তখন ত পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না—তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চল্‌তে হয় তাদের বাহন হচ্চে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র সৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্চে না তবু চল্‌চে। পানীয় রস পাচ্চে না তবু চল্‌চে—বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চল্‌চে—নিঃশব্দে চল্‌চে।—যখন মনে হয় সাম্‌নে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনো তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মত ছুটে আসে—তখন

সে ধূলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মত এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে ?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে —সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়, হৃদয়কে ডাকাডাকি করি হৃদয় সাড়া দেয় না—কেবলি মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্চি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চল্‌তে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্চেই অগ্রসর হচ্চেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আস্‌চে তাতে সন্দেহমাত্র নেই! ঐ দেখ হঠাৎ এক-

দিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস্ দেখা দেয় —সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধু-ফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জ্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা—সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্চে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা ত বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখ্‌তে পারে—ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি—কিন্তু নিষ্ঠা হচ্চে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্চে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে

তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করেনা। এই আমাদের মরু-পথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহঙ্কার করে না, কোনো দাবী করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তাঁর সুখ।

১৭ই ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয় – সে আমাদের কেবলি সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চল্‌তে চল্‌তে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুল্‌তে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কি হচ্চে! এ কি করচ! সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্চে পিপাসার সময় উপায় কি হবে!

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা

হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় এই যে জিনিষটা এমন করে ফেলা ছড়া করচ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে—একটু চুপ কর, একটু স্থির হও—অত বাড়িয়ে বোলো না— অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলো না—যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে থামকা পা ডুবিয়ে বোসো না।* আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনো সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কি কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়—তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে—সহজকবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি—তখন স্খলন হওয়াই

শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না—তখন পদে পদে যতিঃপতন হয়—যেখানে থাম্‌বার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থাম্‌বার সেখানে বেগ সামলাতে পারিনে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ওকি! ঐযে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল! ঐযে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখাবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে! ঐ যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্চ এই পবিত্র নির্ম্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মত শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শ ই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই

জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্য্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গণি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন—তাঁর কঠোর মূর্ত্তিই প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে—এই চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি, শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিলনা, তাদের সমুদ্র যাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না—তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্ত্তি দেখবার জন্তে ব্যস্ত ছিল—কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে

পড়ে—এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগ্‌ল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য্য ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোন নিশ্চয় চিহ্ন না দেখ্‌তে পেয়েও নিঃশব্দে চল্‌তে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না—তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল—তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না—তখন সকলেই আনন্দিত—সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে যায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধুজ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়—বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনে যাকে আমার সত্য বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ

বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি—তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে, সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আস্‌বে—যখন তীরের পাখী তোমার মাস্তলের উপর উড়ে বস্‌বে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাক্‌বে না—কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাত-সহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে—সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে—সে যেন হাল আঁক্‌ড়ে বসেই থাকে।

১৭ই ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করচেন—তিনি বড় প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্চেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চল্‌চে তা আমরা জানিনে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিইনি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্য্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্ম্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্ত্তেই কাজ করচেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথচেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ম্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন—আমার এই

জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড় আনন্দ—আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য্য শিল্প-রচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্চে, কত বিদ্ধ করতে হচ্চে, কত দগ্ধ করতে হচ্চে, কত আঘাত করতে হচ্চে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্ম্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্ম্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করচেন সে দিকে আমি ত তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিল্‌চি মিশচি হাসি গল্প করচি আর ভাবচি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্চে—যেন দিনটা কাটানই হচ্চে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানব জীবনের নাট্যশালায়

প্রবেশ করে যে দিকে অভিনয় হচ্চে সেদিকে মূঢ়ের মত পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি—নাট্য-শালার থামগুলো, চৌকি গুলো, এবং লোক-জনের ভিড়ই দেখছি—তারপরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়ত নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কি কর্‌তে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কি, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কি করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্চে সে দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না!

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করচেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করচেন—ঐ থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র, ঐগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনি সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্চে সমস্তই যে অন্তরে হচ্চে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনি ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হচ্চে একি কেবলি তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্‌দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্ম্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্ত্তে একেবারে অরুণ-রাগে প্লাবিত করে দিলেন—চেয়ে দেখ তোমারি অন্তরে তরুণ সূর্য্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মত মাথা তুলে উঠ্‌চে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপ্‌ড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করচে—তোমারি অন্তরে। এই ত বিশ্বকর্ম্মার আনন্দ। তোমারি এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রূপোর সুতো এত রং বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড় একটা আশ্চর্য্য বুনানি বুন্‌চেন —এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনি দেখ। এই প্রভাতকে

তোমারি অন্তরের প্রভাত বলে দেখ—তোমারি চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখ—এ আর কারু নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারি মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জ্জনতার মধ্যে তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা—দিনে রাত্রে অবিশ্রাম।—এই আশ্চর্য্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে এ'কে কেবলি বাইরের দিকে দেখ্‌তে গেলে এ'তে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না!

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন—বরফ পড়চে। লণ্ডন ছাড়িয়ে ষ্টেশন গুলি বাম দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম

দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে ষ্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগ্‌লুম। আমার গম্য ষ্টেশনটি শেষ ষ্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম্‌ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কি হল! পরের ষ্টেশনে যখন গাড়ি থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক ষ্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আস্‌চ! তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন্‌ পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম—অর্দ্ধরাত্রে। গম্য ষ্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের ষ্টেশন গুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডানদিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

একটার পর একটা পার হয়েই গেলুম। যে স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই ঐ বামদিকেই চেয়ে দেখ্‌লুম—দেখ্‌লুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে সুযোগ কেটে গেল—গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন্ পাওয়া যাবে! এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন্ পাব—কোন্ অর্দ্ধরাত্রে!

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা ষ্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি—সেখানকার প্ল্যাটফর্ম্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কি আছে! কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠ্‌লুম—

অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চল্লুম কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল—ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে—ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিট্‌বে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল!

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি! তোমার আনন্দলীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উল্টোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরচি এ সমস্ত কি—তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলি দেখ্‌চি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্চিনে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্চি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে

কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে ? হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই—আমি হতভাগ্য। সেই জন্যে আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখ্‌চি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জান্‌তেই পারচিনে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জান্‌তে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননি—তা হলেই একমুহূর্তে জান্‌তে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি—অনন্তকাল আমার রক্ষা—নইলে অরক্ষাভয়ের কান্না কোনোমতেই থাম্‌বে না।

১৮ই ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা সৌখীন রকমের যোগ রক্ষা করার মৎলব মানুষের দেখ্‌তে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেই রকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এসো কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এসো—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়—ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়! এ আসনটায় বোসনা এটাতে আমার অমুক বসে—এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখচি। এই করতে করতে

সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কি দেবে। তাঁকে যা দেবে সে ত কখনো সে আর ভোগ করতে পারবেনা। সেইজন্যে সে যে জিনিষের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মত দেবার কথায়, মন আকুল করে তুল্‌তে লাগ্‌ল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সব চেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেই টুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের

উদ্বৃত্ত। ঈশ্বরের নামগাঁথা দুটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল—দুটি একটি সঙ্গীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভাল বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল—বল্লুম বেশ হল, বেশ লাগ্‌ল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে—আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

এ'কেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিত্তার, ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না—তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকেনা কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্চে উপাসনার মধ্যে সব চেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয় নিজের অংশটাকেই সব চেয়ে বড় করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের সরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তন্বুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"—যাতে দুইলোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ঐ দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে;—ঈশ্বরের জন্যে ঐ যে এক পাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিষটা যে একটা মস্ত পাথর—তার ভার যে ভয়ানক ভার—যেদিক-টাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেইদিকটাতেই

যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাৎ হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ঐটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভাল হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তাহলেই দুই লোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই—আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না—সেটা বিষয়কর্ম্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্ম্মের যে গতি তারও সেই গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই

কথাটাকেই পাকা করা যাক্। আমার দুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভাল। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়,—সে যথার্থ ই দুইকে চায় না, সে একেকেই চায়, যখন সে একেকে পায় তখনি সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সঙ্কট এই যে, আজ পর্য্যন্ত সে জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলেঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়—যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয় কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সে রকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি

"পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অম্‌নি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বর বিবর্জ্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনি বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারিনে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস, প্রত্যেক সংস্কারটিই কি কঠিন গ্রন্থি! জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানিনে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে—একটা ছেড়ে ত দেখ্‌তে পাই তার পিছনে আরো পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এত-

দিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিষ সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার! তাদের কোনোটাকেই একটু-মাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কি করে! তারা যে বাঁচ্‌বার জিনিষ নয় তা বেশ জানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চল্‌বে না যে! ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝ্‌ব সে শক্তি কোথায় পাই—বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্ব্বত সমান ভার হয়ে উঠেছে—তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে!

এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন, যে ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন।

ধন এখানে শুধু টাকা নয়। জীবন যা কিছু-কেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে, সে ধনই হোক্ আর খ্যাতিই হোক্—এমন কি, পুণ্যই হোক্।

এমন কি, ঐ পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্চে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্চে। লোকের হিত করচি, ত্যাগ করচি, কষ্ট স্বীকার করচি—অতএব আর ভাবনা নেই—আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ—সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্ম! কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্চি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে কর আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গল কাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসাব দেখবার দরকার নেই—যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্চে। আমরা

যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙচি তার খোঁজও রাখিনে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদেরই সফলতা—এর দ্বারা আমরাই হিত করচি—এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্চে—সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠ্‌চে—সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মত হয়ে দাঁড়াচ্চে—এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে—তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে—পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোল্‌বার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠ্‌চে—এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে

অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলচি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্চিনে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এই জন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড় শক্ত সমস্যা। সে ঐ সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে—ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না—শেষ পর্য্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি—সে সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেই জন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবী কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলি পরামর্শ দিচ্চে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই,—এরি মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর

কিছুই হতে পারে না। তবে কি করা কর্ত্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জান্‌তে হবে—যে জীবন আমার ছিল—সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে লোক নই—আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মত নিরুপায়, অসহায়, অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি—তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তান-জন্ম সম্পূর্ণভাবে সুরু করে দাও—কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্ব্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে

জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস —এস অমৃতের দূত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিল সিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্ত পাবন।
এস গো পরম দুঃখ নিলয়,
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ সাধন॥

১৯শে ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে —তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে ;—সে লক্ষণগুলি কি রকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি, মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিষ যদি জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্ম্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই।

ফল জিনিষটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য— পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসার বৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কি? একটি আম ফল যে পাক্‌চে তারই বা লক্ষণ কি?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে। তার শ্যামবর্ণ ঘুচুবে ঘুচবে করচে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়—কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না—কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণ-সাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আস্‌তে থাকে—চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিল হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের

রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠ্‌তে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড় শক্ত আঁট ছিল—কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্ব্বে তার যে রস ছিল সে রসে তীব্র অম্লতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়—সকলেরই ভোগের হয়—সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেই জন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিষ, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘট্‌তে থাকে—সেটা যে তার নিত্য-পদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্য অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক্ হতে থাকে—ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়—আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন্ নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন—সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আস্‌তে

থাকে—তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই—কেন না তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখীতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে—তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে—অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না—সুতরাং ঐ শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বারম্বার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে—"য এতদ্-বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সে এ সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত—এর ভালমন্দ তার ভালমন্দ আর নয়—এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে ;—ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা ; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ;—ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন

থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে—তখন সে ফলভোগী পাখীর ধর্ম্ম ত্যাগ করে' ফলদর্শী পাখীর ধর্ম্ম গ্রহণ করে—তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে—তখন তার যা কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য্য।

২০ শে ফাল্গুন ১৩১৫

BENGAL LIBRARY
29 APR
WRITERS' BUILDINGS.